দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/DAK24001

যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে প্যারেটোর অভিমত পর্যালোচনা
(Review of Pareto's Views Regarding Logical and Non-logical Actions)

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন*

সারসংক্ষেপ

ভিলফ্রেডো ফেডেরিকো দামাসো প্যারেটো (Vilfredo Federico Damaso Pareto) সমাজ দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রকৌশল, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, সমাজ দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক একাডেমিক জ্ঞানের রাজ্যে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। এ জন্য তিনি বহুশাস্ত্রীয় জ্ঞানের পণ্ডিত হিসেবে বিবেচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজ দর্শনে তাঁর প্রদত্ত ক্রিয়া তত্ত্বটি সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে বর্তমান সমাজের নিরিখে এটির যৌক্তিকতা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে। আমরা জানি, মানুষ সমাজে একাকী বসবাস করতে পারে না। তাই সমাজে বসবাস করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন অংশিজন তথা পড়া, প্রতিবেশী, মহল্লা, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িত থেকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকি। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজস্থ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনে বিভিন্ন লিংকের সহিত যুক্ত হয়ে এসব ক্রিয়া-কর্মকাণ্ড সংঘটিত করছেন। তাই ক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনাটি প্যারেটোর নিকট অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী ধারণা হিসেবে বিবেচিত। ক্রিয়া সংক্রান্ত তত্ত্বটি আলোচনার জন্য প্যারেটো ক্রিয়াকে যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়া-এ দু'টি ভাগে ভাগ করেন। এসব সম্প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে প্যারেটো যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছেন তাহলো: যৌক্তিক ক্রিয়া খুবই সামান্য এবং মানব সত্তা দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত অধিকাংশ ক্রিয়া বা কাজই হলো যুক্তিহীন ক্রিয়ার অন্তর্গত। আলোচ্য প্রবন্ধে প্যারেটো প্রদত্ত ক্রিয়া তত্ত্বটি কীভাবে সমাজস্থ মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করে তা পর্যালোচিত হবে।]

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: daud94@du.ac.bd

[**Abstract:** Vilfredo Pareto holds a significant position in the realm of social philosophy. His contributions to knowledge were unique, as he excelled in diverse academic fields, including economics, politics, engineering, mathematics, sociology, and social philosophy. For this reason, he is regarded as a scholar with extensive and multidisciplinary expertise. The aim of this paper is to discuss and analyze Pareto's theory of action as a branch of social philosophy and assess its relevance in the context of contemporary society. It is well known that humans cannot live alone in society. Therefore, in social settings, we engage in various activities with stakeholders such as neighbors, communities, groups, and other social entities. From this perspective, it can be said that humans establish multiple connections to fulfill their needs and perform these actions. In this context, Pareto's discussion on actions is regarded as a fundamental and analytically significant concept. To analyze his theory of action, Pareto divided actions into two categories: logical actions and non-logical actions. Through this analysis, Pareto emphasized that logical actions are relatively few and are governed by human reasoning. In contrast, most actions performed by individuals fall under the category of non-logical actions. This paper will review various aspects of Pareto's theory of action and explore its implications for understanding human behavior in society.]

চাবি শব্দ: যৌক্তিক ক্রিয়া, উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ, নির্বাহক-পর্যবেক্ষক, বৌদ্ধিক ক্রিয়া, যুক্তিহীন ক্রিয়া এবং অযৌক্তিক ক্রিয়া।

ভূমিকা

ভিলফ্রেডো ফেডেরিকো দামাসো প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩) যিনি বহুলভাবেই ভিলফ্রেডো প্যারেটো[১] নামেই পরিচিত। তিনি ছিলেন বহুবিধ শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পণ্ডিত। তাঁর জ্ঞানের বিচরণ যেসব শাখায় বিদ্যমান ছিল তা হলো সমাজবিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, সমাজ দর্শন, রাষ্ট্র দার্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, প্রকৌশল ইত্যাদি। এটির পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাঁকে সমাজবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ দার্শনিক, রাষ্ট্র দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশিলী হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে প্রথমেই একজন রেলওয়ে প্রকোশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও সমাজ, অর্থনীতি, দর্শন, গণিত, সমাজ দর্শন ও রাজনীতির প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযগী। এটির ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে তাঁর প্রকৌশলী জীবনের ইতি টেনে ১৮৯৩ সালে সুইজারল্যান্ডের লুইসান বিশ্ববিদ্যালয় (University of Lausanne)-এ রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন; এবং জীবনের

অবশিষ্ট অংশ তিনি এখানেই অবস্থান করেন। ১৯০৬ সালে তিনি ইতালির জনগণের সম্পদের ভারসাম্যহীন অবস্থার কথা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে বলেন যে, ইতালির ৮০% ভূমির মালিক ছিলেন ২০% ইতালির জনগণ (Sabbag, 2018, p. 55)।[২] এটি হলো প্যারেটোর একটি মূলনীতি যা ৮০/২০ (80/20 Rule) সূত্র হিসেবে পরিচিত (The Vast Realm of the Non-logical: Uncle Fredo's Empire, 2014, p. 611)। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর কর্মজীবনে সমাজ দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিত, সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুশাস্ত্রীয় একাডেমিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং বহুমাত্রিক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পণ্ডিত সমাজ দার্শনিক প্যারেটো-এর গ্রন্থসমূহ ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় লিখিত ছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে যেসব গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে সেসব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।[৩] তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে *The Mind and Society* গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে যৌক্তিক ক্রিয়া ও যুক্তিহীন ক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন। সুতরাং 'যৌক্তিক ক্রিয়া ও যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে প্যারেটোর অভিমত পর্যালোচনা' সংক্রান্ত প্রবন্ধটি যেসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পর্যালোচনা করা হবে তা হলো: যৌক্তিক ক্রিয়া কীভাবে উদ্দেশ্য-উপায় (Ends-means)-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়? ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ (Subjective-objective) দ্বারা কীভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়? যৌক্তিক ক্রিয়াকে কীভাবে নির্বাহক-পর্যবেক্ষক (Performer-observer) প্রত্যয় দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যৌক্তিক ক্রিয়ার বর্ধিত রূপ হিসেবে বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে কি বিবেচনা করা যায়? যুক্তিহীন ক্রিয়া ও অযৌক্তিক ক্রিয়া কি সমার্থক? মানব সম্পাদিত অধিকাংশ ক্রিয়া কীভাবে যুক্তিহীন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত? আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নেরই যৌক্তিক উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্যারেটোর ক্রিয়া তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য যেসব উৎস ব্যবহৃত হয়েছে সেসবের মধ্যে তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *The Mind and Society* হলো অন্যতম। উক্ত গ্রন্থটি আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি উক্ত গ্রন্থটিকে চার খণ্ডে বিভিক্ত করে সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। আমাদের প্রবন্ধের কাঙ্খিত আলোচনাটি মূলতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে অধিক মাত্রায় জড়িত। উক্ত খণ্ডের প্রথমটিতে তিনি Non-Logical Conduct শিরোনামে মানবীয় ক্রিয়ার দু'টি দিক তথা যৌক্তিক ক্রিয়া ও যুক্তিহীন ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি কখনও যৌক্তিক ক্রিয়াকে বৌদ্ধিক ক্রিয়া রূপে এবং যুক্তিহীন ক্রিয়াকে অযৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেননি। এছাড়াও তিনি *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology* (1968) গ্রন্থেও এ সম্পর্কে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক স্যামুয়েল এডওয়ার্ড

ফাইনার (১৯১৫-১৯৯৩) *Vilfredo Pareto: Sociological Writings Selected and Introduced* নামক গ্রন্থে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর ক্রিয়া তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মানুষের প্রবণতাই হলো মৌলিক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষক এবং কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আরভিং এম. জেইটলিন তাঁর *Ideology and the Development of Sociological Theory* গ্রন্থে যৌক্তিক ক্রিয়াকে তিনি বৌদ্ধিক ক্রিয়া রূপে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন। জার্মান-আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী ও আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান সংঘের ৬৬তম সভাপতি লুইস আলফ্রেড কোসার তাঁর *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context* গ্রন্থে বলেন যৌক্তিক ক্রিয়া হলো এমন একটি ক্রিয়া যেখানে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটি যুক্তিসম্মত বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও তিনি যুক্তিহীন ক্রিয়ার প্রকৃতি অধ্যয়ন করে এটির দু'টির রূপের কথা উল্লেখ করেন। একটি ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং অপরটি হলো অভিজ্ঞতা উর্ধ্ব তত্ত্ব। আমেরিকার গ্রাম্বলিং স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং আমেরিকার সেন্ট ম্যারি'স কলেজের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক উভয়ই তাঁদের *Sociological Thought From Comte to Sorokin* গ্রন্থে যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়ার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা মনে করেন, কর্তার নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো হিসেবে যৌক্তিক ক্রিয়া এবং বিষয়ী হিসেবে যুক্তিহীন ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। প্যারেটোর প্রদত্ত যুক্তিহীন ক্রিয়াকে ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক র‍্যামণ্ড এ্যারন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Main Currents in Sociological Thought 2* -তে যৌক্তিক এবং যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পাশাপাশি যুক্তিহীন ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ নিয়েও তাঁর মত বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। ইরাকের বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মামদুহ কহিল সাব্বাগ তাঁর "Vilfredo Pareto Philosophical Theory, Action & Residue with its Classification" প্রবন্ধে যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। সুতরাং বিভিন্ন বিদ্বান, গবেষকদের উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ- এটিই প্রমাণ করে যে, প্যারেটো প্রদত্ত ক্রিয়া তত্ত্বের যৌক্তিকতা সমাজে আজও বিদ্যমান।

ক্রিয়া তত্ত্ব

স্যামুয়েল এডওয়ার্ড ফাইনার ভিলফ্রেডো প্যারেটোর ক্রিয়া তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন যে, এমন কিছু ক্রিয়া রয়েছে যা মানুষ কোনো ধরনের যুক্তি বা বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকই সহজাতভাবে বা স্বতস্ফূতভাবেই সম্পাদন করে থাকে (Finer, 1966, p. 33)। সাধারণভাবে ক্রিয়া বলতে কাজ (action)-কে বোঝানো হয়। লক্ষ্য পূরণের উপায় বা প্রকিয়ার ক্ষেত্র বিবেচনা করে প্যারেটো উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ, নির্বাহক-পর্যবেক্ষক, প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ক্রিয়াকে যৌক্তিক ও যুক্তিহীন – এ দুই

ভাগে ভাগ করে উক্ত তত্ত্বটি ব্যাখা করেন। এ কারণে তাঁর ক্রিয়াতত্ত্বকে বুঝতে হলে এটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক প্রত্যয়সমূহ (উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ, নির্বাহক-পর্যবেক্ষক)[৪] আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য (Ends) পূরণের উপায় (Means) বা প্রকিয়াই-ই হচ্ছে ক্রিয়া বা কাজ। এখন আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য-উপায় সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করব। যেমন শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চান? এখানে দু'টি বিষয় জড়িত। একটি হলো উদ্দেশ্য এবং অপরটি হলো উপায়। ব্যক্তি যখন কোনো লক্ষ্য বা প্রত্যাশা অর্জন করতে চান তাই উদ্দেশ্য। লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে ব্যক্তি যেসব ধাপ অত্রিক্রম করে তাই উপায়। উল্লিখিত উদাহরণে শিক্ষার্থীগণের লক্ষ্য হলো 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ' হওয়া যা তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের লক্ষ্য পূরণ যেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাহলো মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করা, নিয়মিতভাব শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া, শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা শোনা ও প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নেওয়া, কোর্স সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যাদি। কোনো শিক্ষার্থী যদি উক্ত উপায় বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্য কোনো অলীক বিষয় কল্পনা করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চান তাহলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। এখানে 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ' হলো উদ্দেশ্য এবং 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ' হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ যেসব (ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে) পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাই উপায়।

ইতিমধ্যে আমরা উদ্দেশ্য-উপায় সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এটির ধারাবাহিকতায় এখন আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ সংক্রান্ত রূপ বা আকার নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি, কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সামাজিক বিশ্বে বহুরকমের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারেটো সমাজের চলমান ঘটনা বা প্রপঞ্চকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এদের একটি বস্তুনিষ্ঠ/নৈর্ব্যক্তিক ও অপরটি ব্যক্তিনিষ্ঠ/বিষয়ী/মানসিক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ বলতে বুঝিয়েছেন এমন সত্তাকে যা স্বীয় গুণেই অস্তিত্বশীল ও মানব মনে উদ্ভাসিত হয় (Pareto, 1935, p. 76)। এক কথায় বলা যায় যে, বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক আকারটি হলো এমন যা ইন্দ্রিগোচর বস্তুর প্রকৃত বা বাস্তব অবস্থাকে নিরূপণ করে (Pareto, 1968, p. 27)। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে ব্যক্তি কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বর্ণনার ক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তে উক্ত ঘটনার সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি, প্রমাণ, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি প্রত্যয়সমূহের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করে থাকে বলে এটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বজন নিবেদিত। ধরা যাক 'খ' নামক একজন শিক্ষার্থী চিন্তা করল যে, কোনো একটি কোর্সে পাশ করার জন্য যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মানসম্মত ও উত্তম পরিকল্পনা করে মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করা, নিয়মিতভাব শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া, শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা শোনা, প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নেওয়া, কোর্সের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে কোর্স

শিক্ষকের নিকট থেকে সহয়তা নেওয়া, কোর্স সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আমরা যদি পূর্বের ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ফল পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, তাঁরাও 'খ' নামক শিক্ষার্থীর ন্যায়ই বৈজ্ঞানিক কৌশল গ্রহণ করে উল্লিখিত প্রস্তুতি নিয়েছিলো বলেই পরীক্ষায় পাশ করেছেন। সুতরাং উক্ত প্রক্রিয়ায় পাশ করার বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠ। কারণ এর পক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলতে আমরা সাধারণত ব্যক্তির নিজস্ব মতামত ও পছন্দকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক তথা মানসিক অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কোনো বস্তু বা ঘটনা বা তথ্যের প্রকৃত স্বরূপ উদিত হয় না (Pareto, 1968, p. 27)। এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। কারণ এখানে ব্যক্তি প্রায়ই নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ 'ক' নামক একজন শিক্ষার্থী যিনি দর্শনের ভূমিকা নামক একটি কোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চান। ধরা যাক, 'ক' নামক শিক্ষার্থী লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে উদাসীন, অমনোযোগী, অলস, কর্মবিমুখ ইত্যাদি নেতিবাচক সংশ্লিষ্ট গুণ সম্পন্ন। উক্ত শিক্ষার্থীর নিকট মনে হয়েছে, দর্শনের ভূমিকা নামক কোর্সটি পাশ করা এমন আর বিশেষ কি! এরূপ চিন্তা থেকে তিনি পরীক্ষার আগের রাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন মোবাইল বা সেল ফোনের গ্যালারি বা মেমোরিকার্ডে সন্নিবেশিত করে পরীক্ষার হলে নিয়ে গিয়ে প্রত্যবেক্ষকগণের আড়ালে পরীক্ষার খাতায় লিখে পাশ করা সম্ভব। এটি হলো 'ক' নামক শিক্ষার্থীর একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা (ব্যক্তিনিষ্ঠ)। তাঁর এই ভাবনা কি যৌক্তিক? এক কথায় 'না'। কারণ আমরা যদি উক্ত কোর্সের পরীক্ষার অতীত তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে যে, যিনি বা যাঁরা পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন বা চেষ্টা করেছেন, তিনি বা তাঁরা প্রত্যবেক্ষক কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়ে শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্তে বহিস্কৃত হয়েছেন। কারণ পরীক্ষায় এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে যার নকল করা সম্ভব ছিল না। তাই পরীক্ষায় নকল করে পাশ করা সম্ভব, উক্ত চিন্তা 'ক' নামক শিক্ষার্থীর একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ। অর্থাৎ এটি মোটেও বস্তুনিষ্ঠ নয়। কারণ উক্ত উপায়ে পাশ করার বিষয়টিকে আইনগত, সামাজিক, ধর্মীয় নৈতিকতা ও ইহজাগতিক নৈতিকতা (Secular morality) দিয়ে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের কোনো সুযোগ নেই। নৈর্ব্যক্তিক/বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ আকার সম্পর্কে আরেকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যাক। যেমন একটি বক্র আয়নার কথা আমরা বলতে পারি। উক্ত আয়নায় বস্তুর প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত না হয়ে বিকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বস্তুর বাস্তব বা প্রকৃত অবস্থা সোজা হলে তা উক্ত আয়নায় বাঁকাভাবে প্রদর্শিত হয়। আবার কোনো জিনিস ছোট হলে তা উক্ত আয়নায় বড় আকারে প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রক্রিয়া বিপরীতক্রমেও সত্য। সুতরাং এখানে বস্তু সোজা, জিনিস ছোট হলো নৈর্ব্যক্তিক রূপ এবং বাঁকা, বড় হলো ব্যক্তিনিষ্ঠ রূপ (Pareto, 1968, pp. 27-28)। উক্ত উদাহরণের মাধ্যমে যে বিষয়টি পরিস্ফূটিত হয়েছে

তা হলো নৈর্ব্যক্তিক আকার দ্বারা বস্তু, ঘটনা ও তথ্যের আসল রূপ উদঘাটিত হলেও বিষয়ী রূপটি কর্তৃক বস্তু, ঘটনা ও তথ্যের বাস্তবিক বা সত্যিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয় না।

আমরা ক্রিয়া তত্ত্বকে বুঝার জন্য এটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ আলোচনা করেছি। এখন সর্বশেষ প্রত্যয়টি অর্থাৎ নির্বাহক-পর্যবেক্ষক নিয়ে আলোচনা করব। যিনি বা যাঁরা কর্মটি সম্পাদন করেন তিনি বা তাঁরা হলেন নির্বাহক এবং যিনি বা যাঁরা কর্ম সম্পাদনের বিষয়টি অবলোকন করেন তিনি বা তাঁরা হলেন পর্যবেক্ষক। যেমন 'ক' নামক কোনো একজন ফুটবল খেলোয়াড় যদি দাবি করেন যে, তিনি ২০২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় কোনো একটি দেশের বিরুদ্ধে দু'টি গোল করেছেন। নির্বাহক হিসেবে দাবিকৃত উক্ত খেলোয়াড়ের দু'টি গোল করার বিষয়টি মাঠে উপস্থিত দর্শক বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিলোকিত দর্শক যাঁরা পর্যবেক্ষক হিসেবে বিবেচিত তাঁরা (পর্যবেক্ষকগণ) যদি ঐ খেলোয়াড়ের (নির্বাহক) সাথে এক মত পোষণ করেন বা স্বীকৃতি দেন তাহলে তা হবে যৌক্তিক ক্রিয়া। কিন্তু নির্বাহকের দাবিকৃত বিষয়ের সঙ্গে যদি পর্যবেক্ষকগণ দ্বিমত বা মতদ্বৈততা পোষণ করেন তাহলে তা হবে যুক্তিহীন ক্রিয়া। সুতরাং প্যারেটোর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো কোনো কাজ যৌক্তিক হবে কি হবে না তা নির্ভর করে মূলত উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ, নির্বাহক-পর্যবেক্ষক প্রভৃতি প্রত্যেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের যৌক্তিকতা এবং পাশাপাশি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অনুমোদন। এ পর্যায়ে আমরা প্যারেটোর যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব।

যৌক্তিক ক্রিয়া

ভিলফ্রেডো ফেডেরিকো দামাসো প্যারেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Mind and Society*-এর ১ম খণ্ডে Non-logical Conduct শিরোনামে তিনি যুক্তিহীন আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যৌক্তিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণভাবে যৌক্তিক ক্রিয়া বলতে আমরা সেসব ক্রিয়াকে বুঝে থাকি যেখানে ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা যুক্তিসম্মত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে (Coser, 1977, p. 388)। অর্থাৎ একটি ক্রিয়া যৌক্তিক হিসেবে তখনই বিবেচিত হয় যখন তা বস্তুনিষ্ঠভাবে উপায়ে অর্জিত হয়; অথবা বস্তুনিষ্ঠ কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যখন কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলে (Abraham and Morgan, 1997, p.84)। অন্যভাবে বলা যায় যে, যৌক্তিক ক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, উদ্দ্যেশ্য ও উপায়ের যৌক্তিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সর্বোপরি নির্বাহক ও পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে কর্তা যখন কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে তখন তাকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলে। যেমন উপরে উল্লিখিত 'খ' নামক শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। উদাহরণটিতে

উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে একটা যৌক্তিক সেতু বন্ধন রয়েছে; উপায়টি একইসাথে ব্যক্তিনিষ্ঠ (বৈজ্ঞানিক কৌশল গ্রহণ করে পরীক্ষায় পাশ করেছে। বৈজ্ঞানিক কৌশলের কয়েকটি দিক যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন পরিকল্পনা করে মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করা, নিয়মিতভাব শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া, শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা শোনা, প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নেওয়া, কোর্সের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে কোর্স শিক্ষকের নিকট থেকে সহয়তা নেওয়া, কোর্স সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, উপাদান সংগ্রহ করা) ও বস্তুনিষ্ঠ (পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কৌশল গ্রহণ করে 'খ' নামক শিক্ষার্থীর ন্যায় পরীক্ষায় পাশ করার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ রয়েছে) এবং এই উপায়ের মাধ্যমে বাস্তবিক অর্থেই 'খ' নামক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে যা যৌক্তিক ক্রিয়ার একটি উদাহরণ। সুতরাং যৌক্তিক ক্রিয়া বাস্তবিক অর্থেই উদ্দেশ্য-উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্বাহক-পর্যবেক্ষক ত্রয়ী প্রত্যয়সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস।

আরভিং এম. জেইটলিন যৌক্তিক ক্রিয়া (Logical action)- এর সমার্থক হিসেবে বৌদ্ধিক ক্রিয়া (Rational action)- কে বিবেচনা করেছেন (Zeitlin, 1968, p.170)। কিন্তু প্যারেটো সর্বদায় যৌক্তিক ক্রিয়া প্রত্যয়টিই ব্যবহার করেছেন (Finer, 1966, p.33)। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যৌক্তিক ক্রিয়া আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান ও নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পাদিত হয়। যেমন কোনো একজন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বহুল পরিচিত H_2O সূত্রটি বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রয়োগ করে পানি তৈরি করতে পারেন। অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বিজ্ঞান গবেষণাগারে গিয়ে হাইড্রোজেন দুই অণু পরিমাণ এবং অক্সিজেন এক অণু পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সূত্রটির সংমিশ্রণ করে পানি তৈরি করতে পারেন। আবার অন্য আরেক জন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী উক্ত সূত্র পুনঃসমীক্ষণ করেও একই রকমের ফল পাবেন। কারণ পুনঃসমীক্ষণ করে এটির যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণীত যা বিজ্ঞানাগার ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই এটি যৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। আবার যুক্তিবিদ্যার একটি নিয়মের কথা বলা যায়। যেমন সহানুমানের উভয় আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদকে কমপক্ষে এক বার ব্যাপ্য হতে হয়। উক্ত নিয়মের লঙ্ঘন হলে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়। এটিও যৌক্তিক ক্রিয়া। কারণ তা বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা সম্পাদিত।

বৌদ্ধিক ক্রিয়া সাধারণত নিয়ম পদ্ধতির পাশাপাশি কর্তার যুক্তি, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদিত হয়। যেমন কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থী একটি কোর্সের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে জানা গেল যে, উক্ত শিক্ষার্থী অসুস্থ থাকায় পরীক্ষায় অংশগ্রণ করতে পারেননি। এটির সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁর চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত একটি অসুস্থতাজনিত সনদ সংযোজন করনে। যেহেতু সেমিস্টার পদ্ধতিতে কোনো একটি কোর্সে 'এফ' গ্রেড থাকলে উক্ত শিক্ষার্থী

অসম্পূর্ণ (ইনকমপ্লিট) হিসেবে বিবেচিত হন সেহেতু অসুস্থতাজনিত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। এখানে উক্ত শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুস্থতাজনিত বিষযটিকে বিবেচনায় নেওয়া– এটি একটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া যা আইনগতভাবে সিদ্ধ। সুতরাং কর্তার অন্যান্য বিষয় যা আইনের পরিপন্থী নয় এমন কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদান করাই হলো বৌদ্ধিক ক্রিয়া। তাই এ দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, যৌক্তিক ক্রিয়ারই বর্ধিত রূপ হলো বৌদ্ধিক ক্রিয়া।

বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকেই যদি যৌক্তিক ক্রিয়া রূপে বিবেচনা করা হয় তাহলে এটির সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু আমরা যদি আইনসম্মত বিধিবিধানের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে এটির সংখ্যা খুবই সামান্য হবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ উপরেই ব্যক্ত হয়েছে যে, যৌক্তিক ক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্যই উদ্দেশ্য ও উপায়, ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ, এবং নির্বাহক ও পর্যবেক্ষক ত্রয়সূত্রের মধ্যে একটি যৌক্তিক সেতুবন্ধন থাকবে যা কাঙ্খিত বিষয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। যেমন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি সাধারণ বা প্রচলিত আইন বা নীতিমালা হলো চূড়ান্ত পরীক্ষায় কলেজিয়েট হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শতকরা ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। কোনো শিক্ষার্থী যদি উক্ত সংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত না থাকে তাহলে নিয়মানুযায়ী শিক্ষার্থী কলেজিয়েট হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

প্যারেটো সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধেন্তে উপনীত হন যে– সভ্য, সংস্কৃতিবান, প্রগতিশীল, শিল্পী ও বিজ্ঞানী শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যে যৌক্তিক ক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে (Pareto, 1935, p. 78)। যেমন পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে 'অক্সিজেন', 'মিটার', 'থার্মোমিটার' ইত্যাদি কতিপয় প্রযুক্তিগত পরিভাষা যা যৌক্তিক কার্যকলাপ করে (Pareto, 1935, p. 513)। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্যারেটো যৌক্তিক বলার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে এটি (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান) পুনঃসমীক্ষা করা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা জানি, কোনো বিজ্ঞানী অথবা বৈজ্ঞানিক শ্রেণি যখন কোনো বিষয় আবিষ্কার করেন তখন তিনি/তাঁরা তা বৈজ্ঞানিক সমাজের সদস্যদের অবহিত করার পাশাশি উক্ত জ্ঞানের সূত্রটির যথার্থতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানাগারে তাঁদের আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের (বৈজ্ঞানিক সমাজের সদস্যদের) দ্বারা যখন স্বীকৃত হবে তখন উক্ত আবিষ্কৃত জ্ঞানের যৌক্তিকতা প্রমাণীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ এখানে পুনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের যৌক্তিকতা প্রমাণের সুযোগ রয়েছে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, H_2O সূত্রটি বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রয়োগ করে পানি তৈরির বিষয়টি প্রমাণীত হওয়ায় তা যৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। তাই প্যারেটো মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি শাস্ত্র প্রদত্ত জ্ঞান যৌক্তিক ক্রিয়ার অন্তর্গত (Finer, 1966,

p.33)। কিন্তু বিজ্ঞানাগার ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞানকে এরূপ প্রমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টসাধ্য বা প্রায়ই অসম্ভব। তাই যৌক্তিক ক্রিয়া সম্পর্কে প্যারেটো বলেন,

> ... logical actions to actions that logically conjoin means to ends not only from the standpoint of the subject performing them, but from the standpoint of other persons who have a more extensive knowledge... (Pareto, 1935, p. 77).

প্যারেটো প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহলো ক) উদ্দেশ্যে-উপায় সম্পর্কটি যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; খ) উক্ত সম্পর্কটি উভয়ের (নির্বাহক ও পর্যবেক্ষক) নিকট অভিন্ন হবে; গ) প্রদত্ত প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিনিষ্ঠ তথা কর্তা দ্বারা যেমন সমর্থিত হবে তেমনি অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি দিয়ে অনুমোদযোগ্য হতে হবে যা বস্তুনিষ্ঠ দিকটিকে নির্দেশ করবে; ঘ) ক্রিয়ার উদ্দেশ্যটি বস্তুনিষ্ঠভাবে অর্জিত হতে হবে; ঙ) ক্রিয়ার উপায়টি একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হতে হবে; চ) ক্রিয়াটির উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যকার বস্তুনিষ্ঠ সংশ্লেষ সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত (Timasheff and Theodorson, 1967, p. 133)।

অতএব যৌক্তিক ক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যেসব ক্রিয়া ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ উভয় দিক থেকেই উদ্দেশ্য-উপায়ের সঙ্গে সুসংবদ্ধভাবে সম্পর্কযুক্ত তা-ই যৌক্তিক ক্রিয়া। অর্থাৎ প্যারেটো যৌক্তিক ক্রিয়া বলতে যা বুঝিয়েছেন তা আমরা একটি সরল সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। সমীকরণটি হলোঃ যৌক্তিক ক্রিয়া = ব্যক্তিনিষ্ঠ + বস্তুনিষ্ঠ। আবার উদ্দেশ্য-উপায়ের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যখন উভয়ের অর্থাৎ নির্বাহক ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তখন তাকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলে। যেমন কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড় যখন শতরান করেন তখন মাঠে উপস্থিত দর্শক যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা তা অবলোকন করছেন। এখানে নির্বাহক ও পর্যবেক্ষক উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে তাহলো উক্ত খেলোয়াড় শতরান করেছেন। সুতরাং প্যারেটো প্রদত্ত যৌক্তিক ক্রিয়ার প্রকৃতি আলোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহলোঃ অ) উদ্দ্যেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে যা 'খ' নামক শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট উদাহরণের মাধামে উপস্থাপিত হয়েছে; আ) বাস্তবিক, অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, ব্যক্তিনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ উভয়ই হতে হবে যা 'খ' নামক শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট উদাহরণে বৈজ্ঞানিক কৌশল গ্রহণ করে পরীক্ষায় পাশ যেটি কর্তার নিকট যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি এটির সপক্ষেও বাস্তব ও অতীত অভিজ্ঞতার তথ্য-প্রমাণ রয়েছে; ই) কল্পনা বা অলীক বা পূর্বপ্রসূত ধারণা হলে চলবেনা যা 'ক' নামক শিক্ষার্থীর মাধ্যেমে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে; ঈ) উদ্দ্যেশ্য ও উপায় উভয়ই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমর্থনযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ উভয় দিক থেকেই উদ্দেশ্য-উপায় সুসংবদ্ধভাবে সম্পর্কযুক্ত; উ) কোনো বিষয় বা ঘটনার ন্যায্যতা

প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক অনুমোদনের বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন উপরের 'ক' নামক শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন কোনোভাবেই সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; ঊ) প্রয়োগকৃত পদ্ধতি বা উপায়ের সাথে প্রাপ্ত ফলাফল বা লক্ষ্যের যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যেমন পূর্বোক্ত 'খ' নামক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে, তিনি পাশের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা প্রাপ্ত লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং ঋ) যৌক্তিক ক্রিয়ার প্রকৃতি যুক্তিসঙ্গত ও চিন্তাপ্রসূত হবে। যেমন পূর্বোক্ত 'খ' নামক শিক্ষার্থী আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে পরীক্ষা পাশের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত; এ) ক্রিয়াটি সম্পর্কে নির্বাহক ও পর্যবেক্ষক একমত পোষণ করবেন। উপরে উল্লিখিত 'খ' নামক শিক্ষার্থীর পাশ করার উপায় সংক্রান্ত দাবীটি নির্বাহক হিসেবে 'খ' যেমন একমত পোষণ করেন তেমনি অধিক জ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতগণও 'খ' প্রদত্ত মতকে অগ্রাহ্য করেননি; ঐ) প্যারেটো যৌক্তিক ক্রিয়াকে কখনও বৌদ্ধিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেননি (Sabbag, 2018, pp. 55-56)।

যুক্তিহীন ক্রিয়া

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্যারেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Mind and Society*-এর ১ম খণ্ডে Non-logical Conduct শিরোনামে মূলত তিনি যুক্তিহীন আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। উক্ত বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যৌক্তিক ক্রিয়ার পরিপূর্ণ বিপরীত মতবাদ হলো যুক্তিহীন ক্রিয়া। যুক্তিহীন ক্রিয়াকে অনেকেই অযৌক্তিক ক্রিয়া (Illogical action) বলে অবহিত করার চেষ্টা করতে চান। প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীন ও অযৌক্তিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণত অযৌক্তিক ক্রিয়া বলতে বুঝায় যেখানে বিশুদ্ধ যৌক্তিক প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে। কিন্তু যুক্তিহীন ক্রিয়া বলতে বুঝায় যা যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এ কারণেই প্যারেটো কোনো অবস্থাতেই অযৌক্তিক ক্রিয়া (Illogical action) ধারণাটি ব্যবহারে আগ্রহী না হয়ে সর্বদায় তিনি যুক্তিহীন ক্রিয়া (Non-logical Actions) প্রত্যয়টিই ব্যবহার করেছেন (Pareto, 1935, p. 77)। সুতরাং যুক্তিহীন ক্রিয়া হলো এমন একটি ক্রিয়া যেখানে উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যকার সম্পর্কটি যুক্তি-নির্ভর নয়। অর্থাৎ যেসব ক্রিয়াকে যুক্তিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিা করা সম্ভব নয় তাই যুক্তিহীন ক্রিয়া। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, 'ক' নামক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রচেষ্টা গ্রহণের করেছেন তা তাঁর দৃষ্টিতে যৌক্তিক। কারণ মানব মনের এরূপ কর্মকাণ্ডের কারণেই প্যারেটো মনে করেন যে, ব্যক্তিনিষ্ঠ দিক থেকে প্রায় সকল মানবীয় কর্মকাণ্ডই যৌক্তিক শ্রেণিভুক্ত (Pareto, 1935, p. 77)। প্রকৃতপক্ষে কি তাই? উত্তর হলো 'না'। কারণ এ ক্রিয়াটিকে কোনোভাবেই আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো যুক্তির সঙ্গেই সম্পর্কিত করে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এক কথায় বলা যায় উদাসীন,

অমনোযোগী, অলস, কর্মবিমুখ অবস্থার কারণে ক্রিয়াটি কোনো প্রকার যুক্তির সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়। তাই যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে প্যারেটো বলেন,

> Non-logical actions originate chiefly in definite psychic states, sentiments, subconcious feelings, and the like (Pareto, 1935, p. 88).

প্যারেটো প্রদত্ত সংজ্ঞাটি যেসব বিষয়কে ইঙ্গিত করছে তাহলো: মানসিক অবস্থা, ভাবপ্রবণতা, আবেগ, অবচেতন অনুভূতি। অর্থাৎ যুক্তিহীন ক্রিয়া বলতে তিনি বিশেষত মানসিক অবস্থা, ভাবপ্রবণতা, আবেগ, অবচেতন অনুভূতি দ্বারা সৃষ্ট, উৎপন্ন ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্যারেটো যুক্তিহীন ক্রিয়া বলতে অযৌক্তিক ক্রিয়াকে বুঝাননি। তাই প্যারেটো প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, আমরা সাধারণত আবেগ, ভাবাবেগ, অবচেতন, অনুভূতি, মানসিক অবস্থা এবং যুক্তিহীন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেসব কাজ করি তাই যুক্তিহীন কাজ। তিনি মনে করেন মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়াই যুক্তিহীন এবং এটির সমর্থনে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় তাও ত্রুটিপূর্ণ। মানুষ যুক্তিহীন কাজকে বৌদ্ধিক করে তোলার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন।

যুক্তিহীন ক্রিয়াকে প্যারেটো ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন। সমাজস্থ মানুষ উক্ত ত্রুটিপূর্ণ বিষয়কে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। এসব বিষয় নিয়ে প্যারেটো তাঁর বিখ্যাত *The Mind and Society* গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেন। এরূপ আলোচনার বিষয়বস্তুকে তিনি বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন যা নিম্নরূপ:

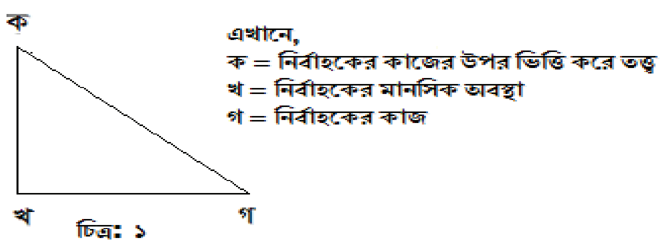

চিত্র: ১
Source: Pareto, 1935, p. 88

উপরের চিত্র: ১ এ 'গ' হলো নির্বাহকের কাজ। উক্ত কাজ ('গ')-এর উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব 'ক'-কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে তত্ত্ব 'ক' দ্বারা আমরা নির্বাহকের কাজ 'গ' সম্পর্কে জানতে পারি। উল্লেখ্য যে, 'ক' এবং 'গ' উভয়ই 'খ'-এর মানসিক অবস্থার প্রকাশ হওয়ায় তাদের সম্পর্ক পরোক্ষ এবং আমরা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি না। এখন আমরা উক্ত বর্ণনার আলোকে একটা উদাহরণ বিশ্লেষণ করতে পারি। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তির দুর্নীতি সম্পর্কে মনের মধ্যে ভয় আছে যাকে আমরা 'খ' দ্বারা প্রকাশ

করছি। উক্ত ভয়ের কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে দুর্নীতি করবেন না যা নির্বাহকের কাজ হিসেবে বিবেচিত যাকে আমরা 'গ' দ্বারা প্রকাশ করছি। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজ অপছন্দ করে যাকে আমরা তত্ত্ব 'ক' দ্বারা প্রকাশ করছি। উপরে প্যারেটো প্রদত্ত চিত্রের আলোকে উল্লিখিত উদাহরণের মান বসিয়ে আমরা যে চিত্র পাই তা নিম্নরূপ:

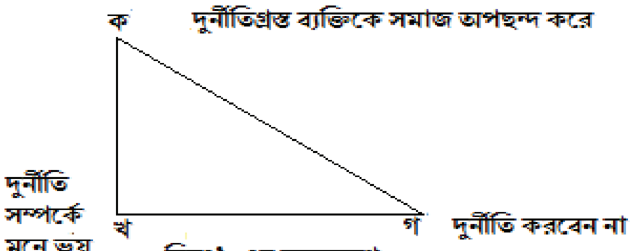

চিত্র:১ এর অনুকরণে

চিত্র: ১ এর অনুকরণে চিত্রিত চিত্রকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাহকের কাজ 'গ' এর উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব 'ক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে তাদের ('গ' এবং 'ক') কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। কারণ এটি নির্বাহকের মানসিক অবস্থা যা আমরা জানতে পারি না। সুতরাং নির্বাহকের আবেগ, অনুভূতি, ভাবাবেগ দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হওয়ায় প্যারেটো এটিকে যুক্তিহীন কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এক কথায় প্যারেটো এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে মানসিক অবস্থার প্রকাশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্যারেটো যুক্তিহীন ক্রিয়াকে চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন যা নিম্নরূপ একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখানো যায় (Aron, 1967, p. 111)।

বস্তুনিষ্ঠ	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ব্যক্তিনিষ্ঠ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ

Aron, 1967, p. 111

ক. না-না শ্রেণি: টেবিলটির ১ম সারির ১ম স্তম্ভে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সম্ভবনার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটি একটি অনিশ্চিত ক্রিয়া। অর্থাৎ ক্রিয়াটির অস্তিত্ব উভয় (ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ) দিক থেকেই অনিশ্চিত। উদ্দেশ্য-উপায়ের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় ক্রিয়াটি কর্তার মনে অথবা বাস্তবে কোথাও এটির অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ কর্তা যেমন নিজে

বিশ্বাস করেন না তেমনিভাবে বাস্তবেও এটির কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না। তাই এটি এক ধরনের দুর্লভ ক্রিয়া (Aron, 1967, p. 111)। কিন্তু বাস্তবে যদি কোনো কারণে তা পাওয়া যায় তখন কর্তা এটির সর্মথনে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন আমাদের সমাজে তেরো নামক গাণিতিক সংখ্যাটি 'অমঙ্গলজনক সংখ্যা তেরো', অভাগা তেরো', 'দুর্ভাগ্যসূচক সংখ্যা তেরো' ইত্যাদি নামে পরিচিত (Yetkin, 2008, p. 11)। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট চাকুরী পরীক্ষায় তাঁর রোল নম্বার হিসেবে তেরো পেয়েছেন। পরীক্ষায় সফল না হওয়ার জন্য তিনি উক্ত রোল নম্বারের বিষয়টিকে বিবেচনা করছেন। অর্থাৎ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গণিতের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেবে তেরো সমাজের অনেকের নিকট অশুভ, অস্বস্তিকর, ক্ষতিকারক, ত্রুটিপূর্ণ, অনুত্তম, নিকৃষ্ট, অমঙ্গল সংখ্যা যা Unlucky thirteen হিসেবেও বিবেচিত। উল্লিখিত ব্যক্তি চাকুরীতে সফল না হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় (পরীক্ষার প্রস্তুতির অভাব, খাতায় সুলিখিতবাবে/উত্তমরূপে প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশ করতে না পারা, মৌখিক পরীক্ষায় নিজের বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি) বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিলো তিনি তা না করে 'তেরো' নামক গাণিতিক সংখ্যাটিকে অশুভ বা অমঙ্গল রূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করে এটির পক্ষে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য যুক্তি দেওয়ার চেষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আমরা জানি, মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণি। যদি তাঁর দ্বারা কোনো অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক, অর্থহীন, হাস্যকর কোনো কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় তাহলে তিনি উক্ত কর্মকাণ্ডের সমর্থনে সঙ্গত কারণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

খ. না-হ্যাঁ শ্রেণি: টেবিলটির ১ম সারির ২য় স্তম্ভে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কেবল ব্যক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ দিকটি অনুপস্থিত। এখানে কর্তা ভুলভাবে কল্পনা বা বিশ্বাস করে যে উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে একটা যৌক্তিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঐ ব্যক্তির ভুল ধারণা। কেননা বাস্তবে ক্রিয়াটি কার্যকারিতাহীন হলেও উক্ত শ্রেণির অগণিত বা অসংখ্য ক্রিয়া সমাজে বিদ্যমান। যেমন সামাজিক বিধিবিধান, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস (Aron, 1967, pp. 111-112)। যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে 'ক' নামক একজন শিক্ষার্থী যিনি পরীক্ষায় পাশের জন্য পরীক্ষার আগের রাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন মোবাইল বা সেল ফোনের গ্যালারি বা মেমোরিকার্ডে সন্নিবেশিত করে পরীক্ষার হলে প্রত্যবেক্ষকগণের দৃষ্টি এড়িয়ে পরীক্ষার খাতায় লিখে পাশ করা সম্ভব বলে মনে করে। এটি একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা যা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। কারণ পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, উক্ত উপায়ে পাশ করার বিষয়টিকে আইনগত, সামাজিক, ধর্মীয় নৈতিকতা ও ইহজাগতিক নৈতিকতা দিয়ে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের কোনো সুযোগ নেই। আবার বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে বৃষ্টি প্রার্থনা করার একটি সামাজিক কুসংস্কার রয়েছে। তাঁরা মনে করেন এরূপ কর্মকাণ্ড করলে বৃষ্টি আসবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙের বিয়ের সঙ্গে বৃষ্টির কোনো

প্রকারের যোগসূত্র নেই তবে বৃষ্টির সঙ্গে মৌসুমী বায়ু, জলবায়ু, মেঘ ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। এখানে ব্যক্তিনিষ্ঠ দিক থেকে উদ্দেশ্য-উপায়ের সম্পর্ক স্বীকৃত হলেও বস্তুনিষ্ঠ দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

গ. হ্যাঁ-না শ্রেণি: তৃতীয় শ্রেণির ক্যাটাগরি হচ্ছে হ্যাঁ-না। উক্ত ক্রিয়া অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান থাকলেও ব্যক্তিনিষ্ঠ দিকটি অনুপস্থিত থাকে। অর্থাৎ ক্রিয়াটির কার্যকারিতা বাস্তবে অস্তিত্বশীল হলেও কর্তা নিজে উক্ত ক্রিয়ার ব্যাপারে অবচেতন থাকেন বা সচেতনভাবে ক্রিয়াটি করেন না। আমাদের অধিকাংশ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অনুভূতির প্রভাবে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণিদেহে যে স্বয়ংক্রিয় ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।) এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন আমাদের আঙ্গুলে যখন পিনের ব্যাথা লাগে তখন আমরা আঙ্গুল সরিয়ে নেই। আবার হারিকেনের গরম চিমনিতে যখন আমাদের হাত লাগে তখন আমরা সাথে সাথে হাতটি সরিয়ে নেই। অন্য আরেকটি উদাহরণ হলো উজ্জ্বল আলো যখন আমাদের চোখে অভিঘাত করে তখন আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন ধূলিকণার ঝড় আসে তখন আমাদের চোখ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ হয়ে যায় যা আমাদের মনের নিকট অপ্রত্যাশিত ও সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু উক্ত ক্রিয়াটি আমরা অবেচতন মনেই করে থাকি (Sabbag, 2018, p. 57)।

ঘ. হ্যাঁ-হ্যাঁ শ্রেণি: র‍্যামণ্ড এ্যারন প্রদত্ত টেবিলের সর্বশেষ প্রকরণ হলো হ্যাঁ-হ্যাঁ শ্রেণির ক্রিয়া যেখানে উভয় (বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ) দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় থাকলেও এদের মধ্যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা অহিংস, জনদরদী, জনহিতৈষী, মানবতাবাদী, বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণের কথা বলতে পারি। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে অস্তিমান ত্রুটিসমূহ বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় অপসারিত করে সমাজের মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়ন করা। অর্থাৎ সমাজে যেমন সমস্যা আছে তেমনি সুনির্দিষ্ট উপায়ে সেসব সমস্যার সমাধান রয়েছে তা ব্যক্তিনিষ্ঠ দিক থেকে তাঁরা যেমন বিশ্বাস করে ঠিক তেমনি বস্তুনিষ্ঠভাবেও এটির সত্যতা রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য কার্যকর কর্মপন্থা গ্রহণ করে কিন্তু তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক পরিবর্তন আশানুরূপ হয়নি (Aron, 1967, pp. 112-113)। আমরা এখানে ফরাসি বিপ্লবের কথা বলতে পারি। এই বিপ্লবের মূল শ্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর মাধ্যমে যৌথ সচেতনতা ভিত্তিক সমাজ গঠন করা। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, যৌথ সচেতনতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের পরিবর্তে সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ বিনির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ সমাজ সত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়টির পরিবর্তে ব্যক্তি সত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটির ফলশ্রুতিতে ফরাসি সমাজের শৃঙ্খলা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পরে (দাউদ, ২০১৩, পৃ. ২৮৩)। তাই বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক জগতে উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের (বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক জগতের) মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায় যা কাঙ্খিত পরিণতি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

র‍্যামণ্ড এ্যারন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Main Currents in Sociological Thought 2*-তে বলেন উল্লিখিত চার ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়ার মধ্যে প্যারেটো দ্বিতীয় ও চতুর্থ (না-হ্যাঁ এবং হ্যাঁ-হ্যাঁ) ক্যাটাগরি বা ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়াসমূহকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ না-হ্যাঁ ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ দিকটি বিদ্যমান না থাকলেও ব্যক্তিনিষ্ঠ পর্যায়টিতে অস্তিমান। ব্যক্তিনিষ্ঠ পর্যায়টির কারণেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, সর্বশেষ বা চতুর্থ শ্রেণি তথা হ্যাঁ-হ্যাঁ শ্রেণির ক্রিয়ায় রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী, উদারতাবাদী, জনদরদী, জনহিতৈষী ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিবর্গ আমাদের জীবনের গতিধারাকে অনেক সময় প্রভাবিত করে থাকে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপ আশানুরূপ হয়নি। কারণ উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা রয়েছে যা গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক জগতের কোনোরূপ ফলপ্রসূ যোগসূত্র নেই।

প্যারেটোর যুক্তিহীন ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে দু'টি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। একটি হলো ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Pseudo-scientific theories) এবং অপরটি হলো অভিজ্ঞতা উর্ধ্ব তত্ত্ব (Theories transcending experiance)। প্রথম তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটি দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একটি ছদ্ম রূপ এবং অপরটি বৈজ্ঞানিক রূপ। ছদ্ম রূপ হলো এমন যা দেখতে প্রকৃত বস্তু, ঘটনা, বচন, যুক্তি ইত্যাদির ন্যায় কিন্তু আসলে তা মিথ্যা, নকল। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক রূপ হলো এমন যা বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত দ্বারা যেমন যাচাই করা যায় তেমনি পুনঃসমীক্ষাও করা যায়। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা পূর্বে উল্লিখিত H_2O দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করতে পারি। কারণ উক্ত সূত্রটিকে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা অনুপাত অনুসারণ করে বিজ্ঞানাগারে তা পুনঃসমীক্ষণ করলে ফল হিসেবে তাঁরা পানি দেখতে পাবেন। এখন আমরা উভয়ের (ছদ্ম রূপ এবং বৈজ্ঞানিক রূপ) সংমিশ্রণে ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারি যে, এটি হলো এমন একটি তত্ত্ব যা দেখতে যৌক্তিক, ন্যায্য, আসল ইত্যাদি বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হলো নকল। অর্থাৎ ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি হলো এমন যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে দাবি করলেও এটির সপক্ষে উপযুক্ত তথ্য, উপাত্ত, সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ। উদাহরণ হিসেবে জৈবিক চাহিদা, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ইত্যাদি যা সরাসরি *রেসিডিউস*-এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। উক্ত তত্ত্বে যদি *রেসিডিউস* উদ্ভাসিত হয় তাহলে তা মানুষের মধ্যে ছলনা, প্রতারণা, ধূর্ত, শঠ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সূচিত করে যা প্রথম প্রকারের রেসিডিউস তথা সংমিশ্রণের *রেসিডিউস*-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতা উর্ধ্ব তত্ত্বটি হলো এমন যা কখনও বৈজ্ঞানিক রূপ

দাবি করে না। অর্থাৎ এটি হলো এমন একটি মতবাদ যা বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্ষম নয়। এ তত্ত্ব সাধারণত মানব কর্মকাণ্ডের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি মূল্য, প্রথা, অভ্যাস এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাত্রাকে বর্ণনা করে। উক্ত তত্ত্বে যদি *রেসিডিউস* প্রকাশ পায় তাহলে তা প্রতীক হিসেবে মানুষের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভাসিত হয়। এটি মূলতঃ দ্বিতীয় প্রকার *রেসিডিউস* তথা ঐতিহ্যগত *রেসিডিউস*-এর মধ্যে বিদ্যমান (Coser, 1977, p. 394)।

উদ্দেশ্য-উপায় এবং নির্বাহক-পর্যবেক্ষক সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেও যৌক্তিক এবং যুক্তিহীন ক্রিয়ার একটা তুলনা করা যায়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য-উপায় সম্পর্ক যদি নির্বাহক এবং পর্যবেক্ষক একমত পোষণ করেন তাহলে তা যৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। যদি তাঁরা (নির্বাহক এবং পর্যবেক্ষক) দ্বিমত বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন তাহলে উক্ত ক্রিয়াকে যুক্তিহীন ক্রিয়া বলে। যেমন 'প' নামক কোনো একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় যদি দাবি করেন যে তিনি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য টি২০ বিশ্বকাপে শতরান করেছেন। নির্বাহক হিসেবে দাবিকৃত উক্ত খেলোয়াড়ের শতরান করার বিষয়টি মাঠে উপস্থিত দর্শক বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিলোকিত দর্শক যাঁরা পর্যবেক্ষক হিসেবে বিবেচিত তাঁরা (পর্যবেক্ষকগণ) যদি ঐ খেলোয়াড়ের (নির্বাহক) সাথে এক মত পোষণ করেন বা স্বীকৃতি দেন তাহলে তা হবে যৌক্তিক ক্রিয়া। কিন্তু নির্বাহকের দাবিকৃত বিষয়ের সঙ্গে যদি পর্যবেক্ষগণ দ্বিমত বা মতদ্বৈততা পোষণ করেন তাহলে তা হবে যুক্তিহীন ক্রিয়া।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, প্যারেটো মানব জীবনের যুক্তিহীন উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। উক্ত উপাদন বিশ্লেষণে তিনি আরোহ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। অর্থাৎ প্যারেটো সমসাময়িক বিশ্ব ও অতীত ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতবাদ, বিশ্বাস, মতাদর্শ ইত্যাদি আরোহ প্রক্রিয়া অবলম্বনে ব্যাপক পরিসরে অধ্যায়ন করে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হন : ক. এসব অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, বিশ্বাস, মতাদর্শ ইত্যাদি মানব কর্মকাণ্ডের নির্ধারক হিসেবে খুবই কম বা কদাচিৎ সক্রিয়; খ. উক্ত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবের্তে বরং নিগূঢ় অনুভূতির প্রকাশই অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কোনো ধারণা ও ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষ যৌক্তিক আচরণ করার পরিবর্তে যুক্তিহীন ক্রিয়া সজ্ঘটনে তাঁদের আচরণ, কৌশল, পন্থা ইত্যাদিকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। অর্থাৎ মানুষের একটা তীব্র প্রবণতা হলো এরূপ কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিক বলে উপস্থান করা। প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তিহীন ক্রিয়া সজ্ঘটনে তাঁরা যেসব আচরণকে যৌক্তিক বলে বিবেচনা করছেন তা পূর্ব থেকেই মানব মনে বিদ্যমান যা মানসিক অবস্থার প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়। তাই এরূপ কর্মকাণ্ড মানুষের মৌলিক অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং

যুক্তিহীন ক্রিয়া স্পষ্টতই প্যারেটো প্রদত্ত যৌক্তিক ক্রিয়ার অন্তর্গত নয় বরং তা *রেসিডুয়াল* শ্রেণিভুক্ত (Coser, 1977, pp. 388-89)। সুতরাং যুক্তিহীন ক্রিয়ার প্রকৃতি আলোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহলো: I) যুক্তিহীন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তির কোনো সম্পর্ক থাকে না; II) যুক্তিহীন ক্রিয়াকে কখনও অযৌক্তিক ক্রিয়া বলা যাবে না যা পূর্বেই উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে; III) উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না যা 'ক' নামক শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট উদাহরণের মাধামে উপস্থাপিত হয়েছে; IV) ব্যক্তিনিষ্ঠ দিক সমর্থিত হলেও বস্তুনিষ্ঠভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন উপরে উল্লিখিত 'ক' নামক শিক্ষার্থীর পাশ সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যক্তি সমর্থিত হলেও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়; V) ক্রিয়াটি সম্পর্কে নির্বাহক ও পর্যবেক্ষকের মতদ্বৈততা রয়েছে। অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত 'ক' নামক শিক্ষার্থীর পাশ করার উপায় সংক্রান্ত দাবিটি নির্বাহক হিসেবে 'ক' দ্বারা অনুসমর্থিত হলেও পণ্ডিতগণ কর্তৃক তা প্রত্যাখাত। কারণ আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো প্রকারের যুক্তির সাহায্যে তা গ্রহণযোগ্যরূপে প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই; VI) যুক্তিহীন ক্রিয়া সাধারণত আবেগ, ভাবাবেগ, অবচেতন, অনুভূতি, মানসিক অবস্থা- এরূপ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত (Sabbag, 2018)।

উপসংহার

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে বলা যায় যে, মানুষের কর্মকাণ্ড নির্ণয়ে ক্রিয়াকে প্যারেটো যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করেন। উদ্দেশ্য-উপায় সম্পর্কে নির্মোহ অবস্থা বজায় রেখে কর্তা যখন কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে তখন এটিকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলে। যৌক্তিক ক্রিয়াকে তিনি উদ্দেশ্য-উপায়, বস্তুনিষ্ঠ-ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং নির্বাহক-পর্যবেক্ষক উল্লিখিত তিনটি উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন যাকে আমরা যৌক্তিক ক্রিয়ার ত্রয়সূত্র রূপে বিবেচিনা করতে পারি। এ কারণে প্যারেটো প্রদত্ত যৌক্তিক ক্রিয়াকে আমরা ত্রয়সূত্রের যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণী রূপ হিসেবে উপস্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এক কথায় যৌক্তিক ক্রিয়া হলো ত্রয়সুত্রের একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশ। কিন্তু প্যারেটো তাঁর *The Mind and Society* গ্রন্থে যৌক্তিক ক্রিয়াকে খুবই স্বল্প সংখ্যক বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু প্যারেটোর এ বক্তব্য স্বীকার করে নিলে সমাজের কমকাণ্ডকে যৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনি যৌক্তিক ক্রিয়ার বর্ধিত রূপ বা সমার্থক হিসেবে বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে বিবেচনা করেননি। কিন্তু আমরা মনে করি, প্যারেটোর দাবিকৃত এ বক্তব্য সংকীর্ণ অর্থে যথার্থ। কারণ এটি সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াই যৌক্তিক যা প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনায় আমরা উপস্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তা গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ বক্তব্য গ্রহণ করলে সমাজে যৌক্তিক ক্রিয়া খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দূরহ। তাছাড়া প্যারেটোর ক্রিয়া তত্ত্ব অনুযায়ী যৌক্তিক এবং যুক্তিহীন ক্রিয়া নির্ণয় অনেক সময় বেশ কষ্টসাধ্য। আবার বাস্তব জীবনের জটিলতায় উদ্দেশ্য ও

উপায়ের মধ্যকার সম্পর্ক কতোটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তাই আমরা মনে করি, যৌক্তিক ক্রিয়ার অনুমোদিত বিধিবিধানের সঙ্গে যদি কর্তার বিশ্বাস, তথ্য, উপাত্ত, যুক্তি, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি (আইনের সঙ্গে যদি সাংঘর্ষিক না হয়) সংযুক্ত হয়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তাহলে এটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। তাই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক ক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে আমরা বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে বিবেচনা করতে পারি যা উক্ত প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে।

অন্যদিকে, যুক্তিহীন ক্রিয়া যুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে বরং উদাসীন, অমনোযোগী, অলস, কর্মবিমুখ অবস্থার সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটায় বলে এটিকে প্যারেটো ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবিত বলে মনে করেন। তাই এ ধরনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তি প্রক্রিয়ার কোনো সংশ্রব নেই। এ কারণে তিনি এটিকে অযৌক্রিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেননি। কারণ পূর্বেই প্রবন্ধের আলোচনার অংশে ব্যক্ত হয়েছে যে, অযৌক্তিক ক্রিয়া হলো এমন যেখানে যথার্থ যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়নি। অর্থাৎ যদি যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহলে এটি আর অযৌক্তিক ক্রিয়া হিসেবে থাকে না। সুতরাং খাঁটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অগ্রসর হলে তা আর অযৌক্তিক ক্রিয়া থাকে না। এদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, যুক্তিহীন ক্রিয়াকে কখনও অযৌক্তিক ক্রিয়ার সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সুতরাং প্যারেটো যুক্তিহীন ক্রিয়ার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা অযৌক্তিক ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক। তাই বলা যায় যে, প্যারেটো যুক্তিহীন ক্রিয়াকে যে অযৌক্তিক ক্রিয়া রূপে সমার্থন করেননি তা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং আমরা মনে করি বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজও প্যারেটো প্রদত্ত ক্রিয়া তত্ত্বটির একটি অর্থবহ গুরুত্ব রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

তথ্যনির্দেশ

১. প্যারেটো ১৮৪৮ সালের ১৫ জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ সালের ১৯ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইতালিয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং মাতা ছিলেন একজন ফ্রান্স নারী। তাই ভিলফ্রেডো প্যারেটো অনেকের নিকটই ফ্রান্স-ইতালিয়ান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত।

২. 80% of the land in Italy was owned by about 20% of the population, Sabbag, 2018, p. 55.

৩. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *A Treatise on General Sociology* (1916) যা ইতালিয়ান ভাষায় লিখিত হলেও পরবর্তীতে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে *The Mind and Society* (1935) নামকরণ করা হয়। প্যারেটোর অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

Manual of Political Economy (1971), *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology* (1968)।

৪. ক্রিয়া তত্ত্বে উদ্দেশ্যকে Ends, উপায়কে Means, ব্যক্তিনিষ্ঠকে Subjective, বস্তুনিষ্ঠকে Objective, নির্বাহককে Performer এবং পর্যবেক্ষককে Observer দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যৌক্তিক ক্রিয়াকে Logical action এবং যুক্তিহীন ক্রিয়াকে ইংরেজি Non-logical action দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Abraham, J. and Morgan, J.H. (1997). *Sociological Thought From Comte to Sorokin*. Macmillan India Ltd.

Aron, R. (1967). *Main Currents in Sociological Thought 2*. Penguin Books.

Coser, L. A. (1977). *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. Hardcourt Brace Jovanovich.

Finer, S. E. (1966). *Vilfredo Pareto: Sociological Writings Selected and introduced* (Derick Mirfin Trans.). Basil Blackwell.

Pareto, V. (1935). *The Mind and Society* (Vol.1. A. Bongirno, A. Living, and J. S. Rogers Trans.). Harcourt Brace and Company.

Pareto, V. (1935). *The Mind and Society* (Vol.2. A. Bongirno, A. Living, and J. S. Rogers Trans.). Harcourt Brace and Company.

Pareto, V. (1968). *The Rise and Fall of the Elites: An Application of Theoritical Sociology* (Introduction by Hans L. Zetterberg.). The Bedminster Press.

Sabbag, Mamduh. K.. (2018). Vilfredo Pareto Philosophical Theory, Action & Residue with its Classification. *International Journal For Empirical Education and Research*. *2*(12). 54-66. DOI: 10.35935/edr/27.6654

The Vast Realm of the Non-logical: Uncle Fredo's Empire. (2014). *Contemporary Sociology*. *43*(5). 609-614. DOI: 10.1177//0094306114545607

Timasheff, N. S. and Theodorson, G. A. (1967). *Sociological Theory: Its Nature and Growth* (4th ed.). Random House.

Yetkin, D. (2008). *Elites, Power Sources and Democracy* (Unpublished Master of Arts Thesis). Sabanci University: Istanbul, Turkey

Zeitlin, Irving, M. (1968). *Ideology and the Development of Sociological Theory*. Prentice-Hall.